রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধুনিক কাব্য

১৩৩৯

মডার্‌ন্‌ বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার্‌নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্‌ন্‌। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হল তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক ব'লে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্‌ন্‌স্‌ থেকে তার শুরু। এই ঝোঁকে একসঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কবি দেখা দিয়েছিলেন। যথা ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌ কোল্‌রিজ শেলি কীট্‌স্‌।

সমাজে সর্বসাধারণের প্রচলিত ব্যবহাররীতিরে আচার বলে। কোনো কোনো দেশে এই আচার ব্যক্তিগত অভিরুচির স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিষন্যকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে রাখে। সেখানে মানুষ হয়ে ওঠে পুতুল, তার চালচলন হয় নিখুঁত কেতা-দুরস্ত। সেই সনাতন অভ্যস্ত চালকেই সমাজের লোকে খাতির করে। সাহিত্যকেও এক-এক সময়ে দীর্ঘকাল আচারে পেয়ে বসে -- রচনায় নিখুঁত রীতির ফোঁটাতিলক কেটে চললে লোকে তাকে বলে সাধু। কবি বার্‌ন্‌সের পরে ইংরেজি কাব্যে যে যুগ এল সে-যুগে রীতির বেড়া ভেঙে মানুষের মর্জি এসে উপস্থিত। 'কুমুদকহ্লারসেবিত সরোবর' হচ্ছে সাধু-কারখানায় তৈরি সরকারি ঠুলির বিশেষ ছিদ্র দিয়ে দেখা সরোবর। সাহিত্যে কোনো সাহসিক সেই ঠুলি খুলে ফেলে, বুলি সরিয়ে, পুরো চোখ দিয়ে যখন সরোবর দেখে তখন ঠুলির সঙ্গে সঙ্গে সে এমন একটা পথ খুলে দেয় যাতে ক'রে সরোবর নানা দৃষ্টিতে নানা খেয়ালে নানাবিধ হয়ে ওঠে। সাধু বিচারবুদ্ধি তাকে বলে, 'ধিক্‌।'

আমরা যখন ইংরেজি কাব্য পড়া শুরু করলুম তখন সেই আচার-ভাঙা ব্যক্তিগত মর্জিকেই সাহিত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। এডিন্‌বরা রিভিয়ুতে যে-তর্জনধ্বনি উঠেছিল সেটা তখন শান্ত। যাই হোক, আমাদের সেকাল আধুনিকতার একটা যুগান্তকাল।

তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত খুশির দৌড়। ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌ বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আনন্দময় সত্তা উপলব্ধি করেছিলেন সেটাকে প্রকাশ করেছিলেন নিজের ছাঁদে। শেলির ছিল প্ল্যাটোনিক ভাবুকতা, তার সঙ্গে রাষ্ট্রগত ধর্মগত সকলপ্রকার স্থূল বাধার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। রূপসৌন্দর্যের ধ্যান ও সৃষ্টি নিয়ে কীট্‌সের কাব্য। ঐ যুগে বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতার দিকে কাব্যের স্রোত বাঁক ফিরিয়েছিল।

কবিচিত্তে যে-অনুভূতি গভীর, ভাষায় সুন্দর রূপ নিয়ে সে আপন নিত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে

চায়। প্রেম আপনাকে সজ্জিত করে। অন্তরে তার যে আনন্দ বাইরে সেটাকে সে প্রমাণ করতে চায় সৌন্দর্যে। মানুষের একটা কাল গেছে যখন সে অবসর নিয়ে নিজের সম্পর্কীয় জগৎটাকে নানারকম করে সাজিয়ে তুলত। বাইরের সেই লজ্জাই তার ভিতরের অনুরাগের প্রকাশ। যেখানে অনুরাগ সেখানে উপেক্ষা থাকতে পারে না। সেই যুগে নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলিকে মানুষ নিজের রুচির আনন্দে বিচিত্র ক'রে তুলেছে। অন্তরের প্রেরণা তার আঙুলগুলিকে সৃষ্টিকুশলী করেছিল। তখন দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘটিবাটি গৃহসজ্জা দেহসজ্জা রঙে রূপে মানুষের হৃদয়কে জড়িয়ে দিয়েছিল তার বহিরুপকরণে। মানুষ কত অনুষ্ঠান সৃষ্টি করেছিল জীবনযাত্রাকে রস দেবার জন্যে। কত নূতন নূতন সুর ; কাঠে ধাতুতে মাটিতে পাথরে রেশমে পশমে তুলোয় কত নূতন নূতন শিল্পকলা। সেই যুগে স্বামী তার স্ত্রীর পরিচয় দিয়েছে, প্রিয়শিষ্যাললিতে কলাবিধৌ। যে দাম্পত্যসংসার রচনা করত তার রচনাকার্যের জন্য ব্যাঙ্কে-জমানো টাকাটাই প্রধান জিনিস ছিল না, তার চেয়ে প্রয়োজন ছিল ললিতকলার। যেমন-তেমন ক'রে মালা গাঁথলে চলত না ; চীনাংশুকের অঞ্চলপ্রান্তে চিত্রবয়ন জানত তরুণীরা ; নাচের নিপুণতা ছিল প্রধান শিক্ষা ; তার সঙ্গে ছিল বীণা বেণু, ছিল গান। মানুষে মানুষে যে-সম্বন্ধ সেটার মধ্যে আত্মিকতার সৌন্দর্য ছিল।

প্রথম বয়সে যে ইংরেজ কবিদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল তাঁরা বাহিরকে নিজের অন্তরের যোগে দেখেছিলেন ; জগৎটা হয়েছিল তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত। আপন কল্পনা মত ও রুচি সেই বিশ্বকে শুধু যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত।

ওয়ার্ড্‌স্বার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ড্‌স্বার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকেরও নিজের হয়ে উঠত। বিশেষ কবির জগতে যেটা আমাদের আনন্দ দিত সেটা বিশেষ ঘরের রসের আতিথ্যে। ফুল তার আপন রঙের গন্ধের বৈশিষ্ট্যদ্বারায় মৌমাছিকে নিমন্ত্রণ পাঠায় ; সেই নিমন্ত্রণলিপি মনোহর। কবির নিমন্ত্রণেও স্বভাবতই সেই মনোহারিতা ছিল। যে-যুগে সংসারের সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব-সম্বন্ধটা প্রধান সে-যুগে ব্যক্তিগত আমন্ত্রণকে সযত্নে জাগিয়ে রাখতে হয় ; সে-যুগে বেশে ভূষায় শোভনরীতিতে নিজের পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার একটা যেন প্রতিযোগিতা থাকে।

দেখা যাচ্ছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পূর্ববর্তীকালের আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল। তখনকার কালে সেইটেই হল আধুনিকতা। কিন্তু, আজকের দিনে সেই আধুনিকতাকে মধ্যভিক্টোরীয় প্রাচীনতা সংজ্ঞা দিয়ে তাকে পাশের কামরায় আরাম-কেদারায় শুইয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খট্‌খটে আধুনিকতা। ক্ষণে ক্ষণে গালে পাউডার, ঠোঁটে রঙ লাগানো হয় না তা নয় ; কিন্তু সেটা প্রকাশ্য, উদ্ধত অসংকোচে। বলতে চায় মোহ জিনিসটাতে আর-কোনো দরকার নেই। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিতে পদে পদে মোহ ; সেই মোহের বৈচিত্র্যই নানা রূপের মধ্য দিয়ে নানা সুর বাজিয়ে তোলে। কিন্তু, বিজ্ঞান তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার ক'রে দেখেছে ; বলছে, মূলে মোহ নেই, আছে কার্বন, আছে নাইট্রোজেন, আছে ফিজিওলজি, আছে সাইকলজি। আমরা সেকালের কবি, আমরা এইগুলোকেই গৌণ জানতুম, মায়াকেই জানতুম মুখ্য। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছন্দে বন্ধে ভাষায় ভঙ্গিতে মায়া বিস্তার ক'রে মোহ জন্মাবার চেষ্টা করেছি, এ

কথা কবুল করতেই হবে। ইশারা-ইঙ্গিতে কিছু লুকোচুরি ছিল ; লজ্জার যে-আবরণ সত্যের বিরুদ্ধ নয়, সত্যের আভরণ, সেটাকে ত্যাগ করতে পারি নি। তার ঈষৎ বাষ্পের ভিতর দিয়ে যে রঙিন আলো এসেছে সেই আলোতে উষা ও সন্ধ্যার একটি রূপ দেখেছি, নববধূর মতো তা সকরুণ। আধুনিক দুঃশাসন জনসভায় বিশ্বদ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করতে লেগেছে ; ও দৃশ্যটা আমাদের অভ্যস্ত নয়। সেই অভ্যাসপীড়ার জন্যেই কি সংকোচ লাগে। এই সংকোচের মধ্যে কোনো সত্য কি নেই। সৃষ্টিতে যে আবরণ প্রকাশ করে, আচ্ছন্ন করে না, তাকে ত্যাগ করলে সৌন্দর্যকে কি নিঃস্ব হতে হয় না।

কিন্তু, আধুনিক কালের মনের মধ্যেও তাড়াহুড়ো, সময়েরও অভাব। জীবিকা জিনিসটা জীবনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। তাড়া-লাগানো যন্ত্রের ভিড়ের মধ্যেই মানুষের হূ হূ ক'রে কাজ, হুরমূর ক'রে আমোদ-প্রমোদ। যে-মানুষ একদিন রয়ে-বসে আপনার সংসারকে আপনার ক'রে সৃষ্টি করত সে আজ কারখানার উপর বরাত দিয়ে প্রয়োজনের মাপে তড়িঘড়ি একটা সরকারি আদর্শে কাজ-চালানো কাণ্ড খাড়া ক'রে তোলে। ভোজ উঠে গেছে, ভোজনটা বাকি। মনের সঙ্গে মিল হল কি না সে কথা ভাববার তাগিদ নেই, কেননা মন আছে অতি প্রকাণ্ড জীবিকা-জগন্নাথের রথের দড়ি ভিড়ের লোকের সঙ্গে মিলে টানবার দিকে। সংগীতের বদলে তার কণ্ঠে শোনা যায়, 'মারো ঠেলা হেঁইয়োঁ।' জনতার জগতেই তাকে বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়, আত্মীয়সম্বন্ধের জগতে নয়। তার চিত্তবৃত্তিটা ব্যস্তবাগীশের চিত্তবৃত্তি। হুড়োহুড়ির মধ্যে অসজ্জিত কুৎসিতকে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রবৃত্তি তার নেই। কাব্য তা হলে আজ কোন্ লক্ষ্য ধরে কোন্ রাস্তায় বেরোবে। নিজের মনের মতো ক'রে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন আর চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা-কিছু আছে তাকে আছে ব'লেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। এই বৈজ্ঞানিক মনের প্রধান আনন্দ কৌতূহলে, আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনে নয়। আমি কী ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিসটা স্বয়ং ঠিকমত কী সেইটেই বিচার্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক।

তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থায় যে-ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রধান ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাযন বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এইজন্যে পাঁচিলের উপর রূঢ় কুশ্রীভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা। একজন কবি লিখেছেন ;I am the greatest laugher of all ।বলছেন,' আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে বড়ো, ওক গাছের চেয়ে, ব্যাঙের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়ে।' Than the frog and Apolloএটা হল ভাঙা কাচ। পাছে কেউ মনে করে কবি মিঠে করে সাজিয়ে কথা কইছে। ব্যাঙ না বলে যদি বলা হত সমুদ্র, তা হলে এখনকার যুগ আপত্তি করে বলতে পারত, ওটা দস্তুরমত কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উলটো ছাঁদের দস্তুরমত কবিয়ানা হল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ, ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া।

এইটেই হালের কায়দা। কিন্তু, কথা এই যে, ব্যাঙ জীবটা ভদ্র কবিতায় জল-আচরণীয় নয়, এ কথা মানবার দিন গেছে। সত্যের কোঠায় ব্যাঙ অ্যাপলোর চেয়ে বড়ো বৈ ছোটো নয়। আমিও

ব্যাঙকে অবজ্ঞা করতে চাই নে। এমন-কি, যথাস্থানে কবিপ্রেয়সীর হাসির সঙ্গে ব্যাঙের মক্‌মক্‌ হাসিকে এক পঙ্‌ক্তিতেও বসানো যেতে পারে, প্রেয়সী আপত্তি করলেও। কিন্তু, অতিবড়ো বৈজ্ঞানিক সাম্যতত্ত্বেও যে-হাসি সূর্যের, যেহাসি ওক্‌বনস্পতির, যে-হাসি অ্যাপলোর, সে-হাসি ব্যাঙের নয়। এখানে ওকে আনা হয়েছে জোর ক'রে মোহ ভাঙবার জন্যে।

মোহের আবরণ তুলে দিয়ে যেটা যা সেটাকে ঠিক তাই দেখতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মায়ার রঙে যেটা রঙিন ছিল আজ সেটা ফিকে হয়ে এসেছে ; সেই মিঠের আভাসমাযন নিয়ে ক্ষুধা মেটে না, বস্তু চাই। 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' বললে প্রায় বারোআনা অত্যুক্তি করা হয়। একটি আধুনিকা মেয়ে কবি গত যুগের সুন্দরীকে খুব স্পষ্ট ভাষায় যে-সম্ভাষণ করেছেন সেটাকে তর্জমা ক'রে দিই। তর্জমায় মাধুরী সঞ্চার করলে বেখাপ হবে, চেষ্টাও সফল হবে না --

তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি
যেন পুরনো একটা যাষনার সুর
বাজছে সেকেলে একটা সারিন্দি যন্ত্রে।
কিম্বা তুমি সাবেক আমলের বৈঠকখানায়
যেন রেশমের আসবাব, তাতে রোদ পড়েছে।
তোমার চোখে আয়ুহারা মুহূর্তের
ঝরা গোলাপের পাপড়ি যাচ্ছে জীর্ণ হয়ে।
তোমার প্রাণের গন্ধটুকু অস্পষ্ট, ছড়িয়ে পড়া,
ভাঁড়ের মধ্যে ঢেকে-রাখা মাথাঘষা মসলার মতো তার ঝাঁজ।
তোমার অতিকোমল সুরের আমেজ আমার লাগে ভালো --
তোমার ওই মিলে-মিশে-যাওয়া রঙগুলির দিকে তাকিয়ে
আমার মন ওঠে মেতে।
আর আমার তেজ যেন টাঁকশালের নতুন পয়সা
তোমার পায়ের কাছে তাকে দিলেম ফেলে।
ধুলো থেকে কুড়িয়ে নাও,
তার ঝক্‌মকানি দেখে হয়তো তোমার মজা লাগবে।

এই আধুনিক পয়সাটার দাম কম কিন্তু জোর বেশি, আর এ খুব স্পষ্ট, টং ক'রে বেজে ওঠে হালের সুরে। সাবেক-কালের যে মাধুরী তার একটা নেশা আছে, কিন্তু এর আছে স্পর্ধা। এর মধ্যে ঝাপসা কিছুই নেই। এখনকার কাব্যের যা বিষয় তা লালিত্যে মন ভোলাতে চায় না। তা হলে সে কিসের জোরে দাঁড়ায়। তার জোর হচ্ছে আপন সুনিশ্চিত আত্মতা নিয়ে, ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারেক্টার। সে বলে, 'অয়মহং ভোঃ, আমাকে দেখো।' ঐ মেয়ে কবি, তাঁর নাম এমি লোয়েল, একটি কবিতা লিখেছেন লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে। ব্যাপারখানা এই যে, সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বরফের ঝাপটা উড়িয়ে হাওয়া বইছে, ভিতরে পালিশ-করা কাচের পিছনে লম্বা সার করে ঝুলছে লাল চটিজুতোর মালা --like stalactites of blood flooding the eyes of passers-by with dripping color, jamming their crimson reflections against the windows of cabs and tramcars, screaming their claret and salmon into the teeth of the sleet, plopping their little round maroon lights upon the tops of umbrellas. The row of white, sparkling shop fronts is gashed and bleeding, it bleeds red slippers। সমস্তটা এই চটি-জুতো নিয়ে।

একেই বলা যায় নৈর্ব্যক্তিক, impersonal। ঐ চটিজুতোর মালার উপর বিশেষ আসক্তির কোনো কারণ নেই, না খরিদ্‌দার না দোকানদার ভাবে। কিন্তু, দাঁড়িয়ে দেখতে হল, সমস্ত ছবির একটা আত্মতা যেই ফুটে উঠল অমনি তার তুচ্ছতা আর রইল না। যারা মানে-কুড়ানিয়া তারা জিজ্ঞাসা করবে, 'মানে কী হল, মশায়। চটিজুতো নিয়ে এত হল্লা কিসের, নাহয় হলই বা তার রঙ লাল।' উত্তরে বলতে হয়, 'চেয়েই দেখো-না।' 'দেখে লাভ কী' তার কোনো জবাব নাই।

নন্দনতত্ব(Aesthetics)সম্বন্ধে এজ্‌রা পৌণ্ডের একটি কবিতা আছে। বিষয়টি এই যে, একটি মেয়ে চলেছিল রাস্তা দিয়ে, একটা ছোটো ছেলে, তালি দেওয়া কাপড় পরা, তার মন উঠল জেগে, সে থাকতে পারল না ; বলে উঠল, "দেখ্‌ চেয়ে রে, কী সুন্দর।" এই ঘটনার তিন বৎসর পরে ঐ ছেলেটারই সঙ্গে আবার দেখা। সে বছর জালে সার্ডিন মাছ পড়েছিল বিস্তর। বড়ো বড়ো কাঠের বাক্সে ওর দাদাখুড়োরা মাছ সাজাচ্ছিল, ব্রেস্‌চিয়ার হাটে বিক্রি করতে পাঠাবে। ছেলেটা মাছ ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে লাফালাফি করতে লাগল। বুড়োরা ধমক দিয়ে বললে, 'স্থির হয়ে বোস্‌।' তখন সে সেই সাজানো মাছগুলোর উপর হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তির সঙ্গে ঠিক সেই একই কথা আপন মনে বলে উঠল, 'কী সুন্দর।' কবি বলছেন, 'শুনেI was mildly abashed।' সুন্দরী মেয়েকেও দেখো সার্ডিন মাছকেও ; একই ভাষায় বলতে কুণ্ঠিত হোয়ো না, কী সুন্দর। এ দেখা নৈর্ব্যক্তিক -- নিছক দেখা ; এর পঙ্‌ক্তিতে চটিজুতোর দোকানকেও বাদ দেওয়া যায় না। কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা, অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে। সাহিত্যে আবির্ভাবের পূর্বেই এই আধুনিকতা ছবিতে ভর করেছিল। চিত্রকলা যে ললিতকলার অঙ্গ, এই কথাটাকে অস্বীকার করবার জন্যে সে বিবিধপ্রকারে উৎপাত শুরু করে দিলে। সে বললে, আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা ; তার লক্ষণ লালিত্য নয়, যাথার্থ্য। চেহারার মধ্যে মোহকে মানলে না, মানলে ক্যারেক্টারকে অর্থাৎ একটা সমগ্রতার আত্মঘোষণাকে। নিজের সম্বন্ধে সেই চেহারা আর-কিছু পরিচয় দিতে চায় না, কেবল জোরের সঙ্গে বলতে চায় 'আমি দ্রষ্টব্য'। তার এই দ্রষ্টব্যতার জোর হাবভাবের দ্বারা নয়, প্রকৃতির নকলবিশির দ্বারা নয়, আত্মগত সৃষ্টিসত্যের দ্বারা। এই সত্য ধর্মনৈতিক নয়, ব্যবহারনৈতিক নয়, ভাবব্যঞ্জক নয়, এ সত্য সৃষ্টিগত। অর্থাৎ, সে হয়ে উঠেছে ব'লেই তাকে স্বীকার করতে হয়। যেমন আমরা ময়ূরকে মেনে নিই, শকুনিকেও মানি, শুয়োরকেও অস্বীকার করতে পারি নে, হরিণকেও তাই।

কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর ; কেউ কাজের, কেউ অকাজের ; কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেইরকম। কোনো রূপের সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো আর-কোনো জবাবদিহি নেই ; যদি না হয়ে থাকে, যদি তার সত্তার জোর না থাকে, শুধু থাকে ভাবলালিত্য, তা হলে সেটা বর্জনীয়।

এইজন্যে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এইরকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্যতা নয়। এলিয়ট লিখছেন ট

এ-ঘরে ও-ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসর গন্ধ,
তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল।
এখন ছ'টা --
ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, যে অংশে ঠেকল।
বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে
পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুক্‌নো পাতা
আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।
ভাঙা সার্শি আর চিম্‌নির চোঙের উপর
বৃষ্টির ঝাপট লাগে,
আর রাস্তার কোণে একা দাঁড়িয়ে এক ভাড়াটে গাড়ির ঘোড়া,
ভাপ উঠছে তার গা দিয়ে আর সে মাটিতে ঠুকছে খুর।

তার পরে বাসি বিয়ার-মদের গন্ধ-ওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। এই সকালে একজন মেয়ের উদ্দেশে বলা হচ্ছে --

বিছানা থেকে তুমি ফেলে দিয়েছ কম্বলটা,
চিৎ হয়ে পড়ে অপেক্ষা করে আছ,
কখনো ঝিমচ্ছ, দেখছ রাত্রিনতে প্রকাশ পাচ্ছে
হাজার খেলো খেয়ালের ছবি
যা দিয়ে তোমার স্বভাব তৈরি।

তার পরে পুরুষটার খবর এই --

His soul stretched tight across the skies
That fade behind a city block,
Or trampled by insistent feet
At four and five and six o'clock;
And short square fingers stuffing pipes
And evening newspapers, and eyes
Assured of certain certainties,
The conscience of a blackened street
Impatient to assume the world.

এই ধোঁয়াটে, এই কাদামাখা, এই নানা বাসি গন্ধ ও ছেঁড়া আবর্জনাওয়ালা নিতান্ত খেলো সন্ধ্যা, খেলো সকালবেলার মাঝখানে কবির মনে একটা বিপরীত জাতের ছবি জাগল। বললেন --

I am moved by fancies that are curled
Around these images, and cling;

The notion of some infinitely gentle
Infinitely suffering thing.

এইখানেই অ্যাপলের সঙ্গে ব্যাঙের মিল আর টিকল না। এইখানে কূপমণ্ডূকের মক্‌মক্‌ শব্দ অ্যাপলোর হাসিকে পীড়া দিল। একটা কথা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কবি নিতান্তই বৈজ্ঞানিকভাবে নির্বিকার নন। খেলো সংসারটার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এই খেলো সংসারের বর্ণনার ভিতর দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। তাই কবিতাটির উপসংহারে যে কথা বলেছেন সেটা এত কড়া --

মুখের উপরে একবার হাত বুলিয়ে হেসে নাও।
দেখো, সংসারটা পাক খাচ্ছে যেন বুড়িগুলো
ঘুঁটে কুড়োচ্ছে পোড়ো জমি থেকে।

এই ঘুঁটে-কুড়োনো বুড়ো সংসারটার প্রতি কবির অনভিরুচি স্পষ্টই দেখা যায়। সাবেক-কালের সঙ্গে প্রভেদটা এই যে, রঙিন স্বপ্ন দিয়ে মনগড়া সংসারে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার ইচ্ছেটা নেই। কবি এই কাদা ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে দিয়েই কাব্যকে হাঁটিয়ে নিয়ে বলেছেন, ধোপ-দেওয়া কাপড়টার উপর মমতা না ক’রে। কাদার উপর অনুরাগ আছে ব’লে নয়, কিন্তু কাদার সংসারে চোখ চেয়ে কাদাটাকেও জানতে হবে, মানতে হবে ব’লেই। যদি তার মধ্যেও অ্যাপলোর হাসি কোথাও ফোটে সে তো ভালোই, যদি না’ও ফোটে, তা হলে ব্যাঙের লম্ফমান অট্টহাস্যকে উপেক্ষা করবার প্রয়োজন নেই। ওটাও একটা পদার্থ তো বটে -- এই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে ওর দিকেও কিছুক্ষণ চেয়ে দেখা যায়, এর তরফেও কিছু বলবার আছে। সুসজ্জিত ভাষার বৈঠকখানায় ঐ ব্যাঙটাকে মানাবে না, কিন্তু অধিকাংশ জগৎসংসার ঐ বৈঠকখানার বাইরে।

সকালবেলায় প্রথম জাগরণ। সেই জাগরণে প্রথমটা নিজের উপলব্ধি, চৈতন্যের নূতন চাঞ্চল্য। এই অবস্থাটাকে রোমান্টিক বলা যায়। সদ্য-জাগা চৈতন্য বাইরে নিজেকে বাজিয়ে দেখতে বেরোয়। মন বিশ্বসৃষ্টিতে এবং নিজের রচনায় নিজের চিন্তাকে, নিজের বাসনাকে রূপ দেয়। অন্তরে যেটাকে চায় বাইরে সেটাকে নানা মায়া দিয়ে গড়ে। তার পরে আলো তীব্র হয়, অভিজ্ঞতা কঠোর হতে থাকে, সংসারের আন্দোলনে অনেক মায়াজাল ছিন্ন হয়ে যায়। তখন অনাবিল আলোকে, অনাবৃত আকাশে, পরিচয় ঘটতে থাকে স্পষ্টতর বাস্তবের সঙ্গে। এই পরিচিত বাস্তবকে ভিন্ন কবি ভিন্নরকম ক’রে অভ্যর্থনা করে। কেউ দেখে এ’কে অবিশ্বাসের চোখে বিদ্রোহের ভাবে ; কেউ বা এ’কে এমন অশ্রদ্ধা করে যে, এর প্রতি রূঢ়ভাবে নির্লজ্জ ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। আবার খর আলোকে অতিপ্রকাশিত এর যে-আকৃতি তারও অন্তরে কেউ বা গভীর রহস্য উপলব্ধি করে ; মনে করে না, গূঢ় ব’লে কিছুই নেই ; মনে করে না, যা প্রতীয়মান তাতেই সব-কিছু নিঃশেষে ধরা পড়ছে। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা এত কর্কশ, এত নিষ্ঠুর হয়েছিল, তার বহুযুগপ্রচলিত যত-কিছু আদব ও আব্রু তা সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে এমন অকস্মাৎ ছারখার হয়ে গেল ; দীর্ঘকাল যে-সমাজস্থিতিকে একান্ত বিশ্বাস ক’রে সে নিশ্চিন্ত ছিল তা এক মুহূর্তে দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে গেল ; মানুষ যে-সকল শোভনরীতি কল্যাণনীতিকে আশ্রয় করেছিল তার বিধ্বস্ত রূপ দেখে এতকাল যা-কিছুকে সে ভদ্র ব’লে জানত তাকে দুর্বল ব’লে, আত্মপ্রতারণার কৃত্রিম উপায় ব’লে, অবজ্ঞা করাতেই যেন সে একটা উগ্র আনন্দ বোধ করতে লাগল ; বিশ্বনিন্দুকতাকেই সে সত্যনিষ্ঠতা ব’লে আজ ধরে নিয়েছে।

কিন্তু, আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈর্ব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টি এও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার। এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। অনেকে মনে করেন, এই উগ্রতা, এই কালাপাহাড়ি তাল-ঠোকাই আধুনিকতা। আমি তা মনে করি নে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আজ হাজার হাজার লোককে আক্রমণ করলেও বলব না, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটাই দেহের আধুনিক স্বভাব। এহ বাহ্য। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাটার অন্তরালেই আছে সহজ দেহস্বভাব।

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক। কিন্তু, এ'কে আধুনিক বলা নিতান্ত বাজে কথা। এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই। চীনের কবি লি-পো যখন কবিতা লিখছিলেন সে তো হাজার বছরের বেশি হল। তিনি ছিলেন আধুনিক ; তাঁর ছিল বিশ্বকে সদ্য-দেখা চোখ। চারটি লাইনে সাদা ভাষায় তিনি লিখছেন --

এই সবুজ পাহাড়গুলোর মধ্যে থাকি কেন।
প্রশ্ন শুনে হাসি পায়, জবাব দিই নে। আমার মন নিস্তব্ধ।
যে আর-এক আকাশে আর-এক পৃথিবীতে বাস করি --
সে জগৎ কোনো মানুষের না।
পীচগাছে ফুল ধরে, জলের স্রোত যায় বয়ে।

আর একটা ছবি --
নীল জল -- নির্মল চাঁদ,
চাঁদের আলোতে সাদা সারস উড়ে চলেছে।
ওই শোনো, পানফল জড়ো করতে মেয়েরা এসেছিল ;
তারা বাড়ি ফিরছে রাষেন গান গাইতে গাইতে।

আর-একটা --
নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।
টুপিটা রেখে দিয়েছি ওই পাহাড়ের আগায়,
পাইনগাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার 'পরে।

একটি বধূর কথা --

আমার ছাঁটা চুল ছিল খাটো, তাতে কপাল ঢাকত না।
আমি দরজার সামনে খেলা করছিলুম, তুলছিলুম ফুল।
তুমি এলে আমার প্রিয়, বাঁশের খেলা-ঘোড়ায় চ'ড়ে,
কাঁচা কূল ছড়াতে ছড়াতে।
চাঁঙ্‌কানের গলিতে আমরা থাকতুম কাছে কাছে।
আমাদের বয়স ছিল অল্প, মন ছিল আনন্দে ভরা।
তোমার সঙ্গে বিয়ে হল যখন আমি পড়লুম চোদ্দয়।
এত লজ্জা ছিল যে হাসতে সাহস হত না,
অন্ধকার কোণে থাকতুম মাথা হেঁট ক'রে,
তুমি হাজার বার ডাকলেও মুখ ফেরাতুম না।
পনেরো বছরে পড়তে আমার ভুর্‌কুটি গেল ঘুচে,
আমি হাসলুম। ...
আমি যখন যোলো তুমি গেলে দূর প্রবাসে --
চ্যুটাঙের গিরিপথে, ঘূর্ণিজল আর পাথরের ঢিবির ভিতর দিয়ে।
পঞ্চম মাস এল, আমার আর সহ্য হয় না।
আমাদের দরজার সামনে রাস্তা দিয়ে তোমাকে যেতে দেখছিলুম,
সেখানে তোমার পায়ের চিহ্ন সবুজ শ্যাওলায় চাপা পড়ল --
সে শ্যাওলা এত ঘন যে ঝাঁট দিয়ে সাফ করা যায় না।
অবশেষে শরতের প্রথম হাওয়ায় তার উপরে জমে উঠল ঝরা পাতা।
এখন অষ্টম মাস, হলদে প্রজাপতিগুলো
আমাদের পশ্চিম-বাগানের ঘাসের উপর ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।
আমার বুক যে ফেটে যাচ্ছে, ভয় হয় পাছে আমার রূপ যায় ম্লান হয়ে।
ওগো, যখন তিনটে জেলা পার হয়ে তুমি ফিরবে
আগে থাকতে আমাকে খবর পাঠাতে ভুলো না।
চাঙফেঙ্‌ শার দীর্ঘ পথ বেয়ে আমি আসব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।
দূর ব'লে একটুও ভয় করব না।

এই কবিতায় সেন্টিমেন্টের সুর একটুও চড়ানো হয় নি, তেমনি তার 'পরে বিদ্রূপ বা অবিশ্বাসের কটাক্ষপাত দেখছি নে। বিষয়টা অত্যন্ত প্রচলিত, তবু এতে রসের অভাব নেই। স্টাইল বেঁকিয়ে দিয়ে একে ব্যঙ্গ করলে জিনিসটা আধুনিক হত। কেননা, সবাই যাকে অনায়াসে মেনে নেয় আধুনিকেরা কাব্যে তাকে মানতে অবজ্ঞা করে। খুব সম্ভব, আধুনিক কবি ঐ কবিতার উপসংহারে লিখত, স্বামী চোখের জল মুছে পিছন ফিরে তাকাতে তাকাতে চলে গেল, আর মেয়েটি তখনি লাগল শুকনো চিংড়িমাছের বড়া ভাজতে। কার জন্যে। এই প্রশ্নের উত্তরে থাকত দেড় লাইন ভরে ফুট্‌কি। সেকেলে পাঠক জিজ্ঞাসা করত, 'এটা কী হল।' একেলে কবি উত্তর করত, 'এমনতরো হয়েই থাকে।' 'অন্যটাও তো হয়।' 'হয় বটে, কিন্তু বড়ো বেশি ভদ্র। কিছু

দুর্গন্ধ না থাকলে ওর শৌখিন ভাব ঘোচে না, আধুনিক হয় না।' সেকালে কাব্যের বাবুগিরি ছিল, সৌজন্যের সঙ্গে জড়িত। একেলে কাব্যেরও বাবুগিরি আছে, সেটা পচা মাংসের বিলাসে। চীনে কবিতাটির পাশে বিলিতি কবিদের আধুনিকতা সহজ ঠেকে না। সে আবিল। তাদের মনটা পাঠককে কনুই দিয়ে ঠেলা মারে। তারা যে-বিশ্বকে দেখছে এবং দেখাচ্ছে সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। ওদের চিত্ত যে আজ অসুস্থ, অসুখী, অব্যবস্থিত। এ অবস্থায় বিশ্ববিষয় থেকে ওরা বিশুদ্ধভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ভাঙা প্রতিমার কাঠ খড় দেখে ওরা অট্টহাস্য করে ; বলে, আসল, জিনিসটা এতদিনে ধরা পড়েছে। সেই ঢেলা, সেই কাঠখড়গুলোকে খোঁচা মেরে কড়া কথা বলাকেই ওরা বলে খাঁটি সত্যকে জোরের সঙ্গে স্বীকার করা।

এই প্রসঙ্গে এলিয়টের একটি কবিতা মনে পড়ছে। বিষয়টি এই : বুড়ি মারা গেল, সে বড়ো ঘরের মহিলা। যথানিয়মে ঘরের ঝিলিমিলিগুলো নাবিয়ে দেওয়া, শববাহকেরা এসে দস্তুরমত সময়োচিত ব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত। এ দিকে খাবার ঘরে বাড়ির বড়ো-খান্‌সামা ডিনার-টেবিলের ধারে বসে, বাড়ির মেজো-ঝিকে কোলের উপর টেনে নিয়ে।

ঘটনাটা বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বাভাবিক সন্দেহ নাই। কিন্তু, সেকেলে মেজাজের লোকের মনে প্রশ্ন উঠবে, তা হলেই কি যথেষ্ট হল। এ কবিতাটা লেখবার গরজ কী নিয়ে, এটা পড়তেই বা যাব কেন। একটি মেয়ের সুন্দর হাসির খবর কোনো কবির লেখায় যদি পাই তা হলে বলব, এ খবরটা দেবার মতো বটে। কিন্তু, তার পরেই যদি বর্ণনায় দেখি, ডেন্টিসট্‌ এল, সে তার যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলে মেয়েটির দাঁতে পোকা পড়েছে, তা হলে বলতে হবে, নিশ্চয়ই এটাও খবর বটে কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে বলবার মতো খবর নয়। যদি দেখি কারো এই কথাটা প্রচার করতেই বিশেষ ঔৎসুক্য, তা হলে সন্দেহ করব, তারও মেজাজে পোকা পড়েছে। যদি বলা হয়, আগেকার কবিরা বাছাই ক'রে কবিতা লিখতেন, অতি-আধুনিকেরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে ; এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। কেবল তফাত এই যে, এঁরা সর্বদাই ভয় করেন পাছে এঁদের কেউ বদনাম দেয় যে এঁদের বাছাই করার শখ আছে। অঘোরপন্থীরা বেছে বেছে কুৎসিত জিনিস খায়, দূষিত জিনিস ব্যবহার করে, পাছে এটা প্রমাণ হয় ভালো জিনিসে তাদের পক্ষপাত। তাতে ফল হয়, অ-ভালো জিনিসেই তাদের পক্ষপাত পাকা হয়ে ওঠে। কাব্যে অঘোরপন্থীর সাধনা যদি প্রচলিত হয়, তা হলে শুচি জিনিসে যাদের স্বাভাবিক রুচি তারা যাবে কোথায়। কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না -- প্রথমটাকেই প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব-সাধনা ব'লে বাহাদুরি করতে হবে।

একজন কবি একটি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বর্ণনা করছেন --
রিচার্ড কোডি যখন শহরে যেতেন
পায়ে-চলা পথের মানুষ আমরা তাকিয়ে থাকতুম তাঁর দিকে।
ভদ্র যাকে বলে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত,
ছিপছিপে যেন রাজপুষন।
সাদাসিধে চালচলন, সাদাসিধে বেশভূষা --

কিন্তু যখন বলতেন ‘গুড্ মর্নিং’ আমাদের নাড়ী উঠত চঞ্চল হয়ে।
চলতেন যখন ঝলমল করত।
ধনী ছিলেন অসম্ভব।
ব্যবহারে প্রসাদগুণ ছিল চমৎকার।
যা-কিছু এঁর চোখে পড়ত মনে হত,
আহা, আমি যদি হতুম ইনি।
এ দিকে আমরা যখন মরছি খেটে খেটে,
তাকিয়ে আছি কখন জ্বলবে আলো,
ভোজনের পালায় মাংস জোটে না,
গাল পাড়ছি মোটা রুটিকে --
এমন সময় একদিন শান্ত বসন্তের রাষেন
রিচার্ড কোডি গেলেন বাড়িতে,
মাথার মধ্যে চালিয়ে দিলেন এক গুলি।*১

এই কবিতার মধ্যে আধুনিকতার ব্যঙ্গকটাক্ষ বা অট্টহাস্য নেই, বরঞ্চ কিছু করুণার আভাস আছে। কিন্তু, এর মধ্যে একটা নীতিকথা আছে, সেটা আধুনিক নীতি। সে হচ্ছে এই যে, যা সুস্থ ব’লে সুন্দর ব’লে প্রতীয়মান তার অন্তরে কোথাও একটা সাংঘাতিক রোগ হয়তো আছে। যাকে ধনী ব’লে মনে হয় তার পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ব’সে আছে উপবাসী। যাঁরা সেকেলে বৈরাগ্যপন্থী তাঁরাও এই ভাবেই কথা বলেছেন। যারা বেঁচে আছে তাদের তাঁরা মনে করিয়ে দেন, একদিন বাঁশের দোলায় চড়ে শ্মশানে যেতে হবে। য়ুরোপীয় সন্ন্যাসী উপদেষ্টারা বর্ণনা করেছেন মাটির নীচে গলিত দেহকে কেমন ক’রে পোকায় খাচ্ছে। যে দেহকে সুন্দর ব’লে মনে করি সে যে অস্থিমাংস-রসরক্তের কদর্য সমাবেশ, সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের চট্কা ভাঙিয়ে দেবার চেষ্টা নীতিশাস্ষেন দেখা গেছে। বৈরাগ্যসাধনার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়, এইরকম প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রতি বারে বারে অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে দেওয়া। কিন্তু, কবি তো বৈরাগীর চেলা নয়, সে তো অনুরাগেরই পক্ষ নিতে এসেছে। কিন্তু, এই আধুনিক যুগ কি এমনি জরাজীর্ণ যে সেই কবিকেও লাগল শ্মশানের হাওয়া -- এমন কথা সে খুশি হয়ে বলতে শুরু করেছে, যাকে মহৎ ব’লে মনে করি সে ঘুণে ধরা, যাকে সুন্দর ব’লে আদর করি তারই মধ্যে অস্পৃশ্যতা ?

মন যাদের বুড়িয়ে গেছে তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ স্বাভাবিকতার জোর নেই। সে মন অশুচি অসুস্থ হয়ে ওঠে। বিপরীত পন্থায় সে মন নিজের অসাড়তাকে দূর করতে চায়, গাঁজিয়ে-ওঠা পচা জিনিসের মতো যত-কিছু বিকৃতি নিয়ে সে নিজেকে ঝাঁঝিয়ে তোলে লজ্জা এবং ঘৃণা ত্যাগ কঁরে তবে তার বলিরেখাগুলোর মধ্যে হাসির প্রবাহ বইতে পারে।

মধ্য ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান ক’রে তাকে শ্রদ্ধেয়রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত ক’রে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় ব’লে মনে করে।

বিশ্ববিষয়ের প্রতি অতিমাযন শ্রদ্ধাকে যদি বলো সেন্টিমেন্টালিজ্ম্, তার প্রতি গায়ে-পড়া বিরুদ্ধতাকেও সেই একই নাম দেওয়া যেতে পারে। যে কারণেই হোক, মন এমন বিগড়ে গেলে দৃষ্টি সহজ হয় না। অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতিভদ্রয়ানার পাণ্ডা ব’লে ব্যঙ্গ কর তবে

এডায়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উলটো বিশেষণ দিয়ে। ব্যাপারখানা স্বাভাবিক নয়, অতএব শাশ্বত নয়। সায়ান্সেই বল আর আর্টেই বল, নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন ; য়ুরোপ সায়ান্সে সেটা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায় নি।

---

১ মূল কবিতাটি হাতের কাছে না থাকাতে স্মরণ ক'রে তর্জমা করতে হ'ল, কিছু ষনুটি ঘটতে পারে।